টাইন নদীর ওপার থেকে

জিয়াউল হক

আলোর ঠিকানা
প্রকাশনী

আমার দুটি কথা

আলহামদুলিল্লাহ, ‘টাইন নদীর ওপার থেকে’ বইটা আবারও প্রকাশ হতে যাচ্ছে। ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশের পর দীর্ঘদিন বইটা বাজারে অনুপস্থিত। বিভিন্ন সময়ে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে অনেক পাঠক এ বইটা নিয়ে তাদের আগ্রহ দেখিয়েছেন।

‘আলোর ঠিকানা’ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের বদান্যতায় শ্রদ্ধেয় সেই সব পাঠকদের অপেক্ষার অবসান হতে যাচ্ছে জেনে ভালো লাগছে। আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, সেই সাথে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকেও আন্তরিক মোবারকবাদসহ সবিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

‘টাইন নদীর ওপার থেকে’ বইটা রচনার সাথে আমার আবেগ জড়িত রয়েছে। কানাডার এক নারীর একটা মেইল পেয়ে লিখতে বসেছিলাম। মাত্র কয়েকদিনে একটানা লিখে শেষ করেই পাঠিয়ে দিয়েছিলাম প্রকাশকের টেবিলে।

ঘটনার বিস্তারিত লেখার জায়গা এটা নয়। যে সব সম্মানিত পাঠক বইটা পড়বেন তা তারা বিস্তারিত জানবেন। আমি আনন্দিত যে, বইটা আবারও বাজারে আসছে।

মহান আল্লাহপাক ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে আমার এ শ্রমটুকু কবুল করুন, এটাই আমার চাওয়া। শ্রদ্ধেয় পাঠকদের কাছে আর্জি, দয়া করে আমাকেও আপনাদের প্রাত্যহিক দোয়ায় অন্তর্ভুক্ত রাখবেন।

আল্লাহ হাফেজ।

নিবেদক
জিয়াউল হক
নিউক্যাসল, ইংল্যান্ড।

এক

ফিওনা থোমাস। একালের ফরিহা থোমাস। প্রায় চল্লিশোর্ধা অনিন্দ্য সুন্দরী ইংরেজ মহিলা। তিনি আমাদের হাসপাতালে আসতেন প্রায় প্রতি সপ্তাহে। তার সাথে পরিচয়টাও কর্মস্থলেই হয়েছিল। দীর্ঘকায় লাল গাত্রবর্ণ, স্লিম ফারিহা প্রথম দর্শনেই যে কারও চোখে পড়ার মতো একজন। বয়স আনুমানিক চল্লিশ কিংবা তারচেয়েও দু'এক বৎসর বেশি হবে, তা আগেই বলেছি। আন্দাজে বললাম। কারণ একজন নারীকে তার বয়স জিজ্ঞাসা করতে নেই, সেটা শোভনীয় নয়। অতএব সে প্রসঙ্গ থাক।

ফারিহা একজন ইংরেজ, কিন্তু মুসলমান। একটা সময় ছিল, যখন 'ইংরেজ' আর 'মুসলমান' দুটো পরিচয়ের সমন্বয় হতো না। কিন্তু এখন হয়। একটা সময় ছিল, যখন একজন ইংরেজের মুসলমান হওয়াটা ছিল খবরের মতো একটা খবর; কিন্তু আজকাল অহরহ দেখা যায় ইংরেজ মুসলমান, একেবারে নিরেট, নিখাঁদ ইংলিশ মুসলমান। মাঝে মধ্যেই বিভিন্ন মসজিদে, বিশেষ করে, ইস্ট লন্ডন মসজিদসহ ছোট-বড় বিভিন্ন শহরের মসজিদ বা ইসলামি সেন্টারগুলোতে ইংলিশ নারী-পুরুষরা মুসলমান হচ্ছেন।

একটি দশক, তথা নাইন ইলেভেনের আগে ব্রিটেনে গড়ে প্রতি বৎসর দশ থেকে পনেরো হাজার ইংলিশ মুসলমান হতেন। কিন্তু ২০০১ সালে আমেরিকার নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ারে সন্ত্রাসী হামলা এবং ২০০৩-এ ইরাক ও আফগানিস্থানে ব্রিটেন ও আমেরিকার নেতৃত্বে পশ্চিমা শক্তির যুদ্ধে নেমে পড়ার পর থেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের এই হার ইংলিশদের মধ্যে ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে। ব্রিটেনে এখন প্রতি বৎসর গড়ে ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার ইংলিশ নারী-

পুরুষ ইসলাম গ্রহণ করে থাকেন। আর ২০০৯ সালে এ সংখ্যা ৪০ হাজারে উঠেছে। এই নওমুসলিমদেরই একজন হলেন ফারিহা।

তিনি আসতেন আমাদের হাসপাতালে তার পালক পিতাকে দেখতে। তার পালক পিতা টমাস গ্রে ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত হয়ে শারীরিক ও মানসিকভাবে পঙ্গু হয়ে বিগত কয়েকটা বৎসরই আমাদের এখানে চিকিৎসাধীন আছেন। ভদ্রলোকের ক্লিনিকাল রিহাবিলিটেশনটা আমাকেই দেখতে হয়। সে সূত্রেই ফারিহার সাথে আমার পরিচয়। আলাপও হয় প্রায়। ফারিহা প্রথম যে বার আমাদের এখানে আসেন, সে বারই তার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে। অত্যন্ত শালীন পোশাক এবং ইসলামি কায়দায় পর্দা করে হিজাব পরা দেখে।

তাকে দেখে মনে পড়ে গিয়েছিল কিছুদিন আগেই ব্রিটেনে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত জনৈক ব্রিটিশ মুসলমান ছাত্রীর জিলবাব পরিধান করে স্কুলে যাওয়া নিয়ে হৈ চৈ হয়েছিল, সে কথা। বিষয়টি শেষ পর্যন্ত আদালত অব্দি গড়িয়েছিল। আর পত্র-পত্রিকায়, মিডিয়ায় তা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক হয়েছিল। তারও কিছুদিন আগে পাশের দেশ ফ্রান্সে এই হিজাব নিষিদ্ধ করা নিয়ে ব্যাপক রাজনৈতিক আর সামাজিক অস্থিরতাও আমরা দেখেছি, যার ঢেউ সারা বিশ্বময় লেগেছিল! শেষ পর্যন্ত তো ফ্রান্সে হিজাবকে নিষিদ্ধই করে ফেলা হয়।

একটি গণতান্ত্রিক দেশে তার লক্ষ লক্ষ নাগরিকের মৌলিক অধিকার হরণ করা হয় সভ্যতাগর্বিত বিশ্বের নাকের ডগায়! অভিযোগ যাহোক, এর পেছনে যুক্তি আর কারণ একটাই, আর তা হলো এই যে, এটা নাকি ইউরোপের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচিতিকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্যই করা হয়েছে।

তখনই এই ব্রিটেনের কোনো কোনো মহল হতে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখালিখি করে এ কথাটা বলা হয়েছিল বা বলার চেষ্টা করা হয়েছিল যে, ঢালাওভাবে মুসলিম ইমিগ্র্যান্টদের কারণে ইউরোপ তার স্বকীয়তা হারাচ্ছে! এই ব্রিটেনও তার রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্য হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছে বা দিচ্ছে। এখনই যদি তার লাগাম টেনে ধরা না যায় বা না হয়; তবে পুরো ব্রিটেনই একদিন একটি ইসলামি রাষ্ট্র বনে যাবে! এমন অনেক কুশলী উদ্ভট ও উস্কানিমূলক কথাবার্তা বলা হয়েছে, ফিচার নিবন্ধেও লেখা হয়েছে সে কথা।

পত্র-পত্রিকা একবার কিছু একটা নিয়ে লেখালিখি শুরু করলেই হলো, এক শ্রেণির মানুষ আছে- যারা বিষয়টি নিয়ে তার মতামত দিতে উঠে পড়ে লাগে যেন। তেমনটাই নেমেছিলেন ব্রিটেনের এককালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং হাউজ অব

কমন্সের লিডার, ব্রিটিশ রাজনীতির এক অতি শক্তিশালী পুরুষ, সরকারের প্রভাবশালী নেতা মি. জ্যাক স্ট্র স্বয়ং। বলেছিলেন, 'মুখে নেকাব ব্যবহার করাটা হলো ব্রিটিশ সমাজে দৃশ্যমান বৈপরিত্য এবং সুস্পষ্ট সাতন্ত্রবোধের পরিচায়ক।' তার মতে, এটি মুসলমানদের ব্রিটিশ সমাজব্যবস্থায় ইন্টিগ্রেশনের পথে বড় বাধা।

মনে পড়ে মি. ষ্ট্র'র ওই মন্তব্যের জের ধরে লন্ডনের সাপ্তাহিক পত্রিকায় আমার নিয়মিত কলামে তার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন রেখেছিলাম, এই ব্রিটেনেই তো হাজার হাজার নেকাব পরা নারী ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল, সলিসিটর, শিক্ষকসহ অন্যান্য পেশায় কাজ করে আসছেন! কোনোদিনও কি তাদের কারও বিরুদ্ধে কোনো ইমপ্লয়ার বা ক্লায়েন্টের পক্ষ হতে 'নেকাবের কারণে ইন্টিগ্রেশনের পথে বা সুষ্ঠুভাবে কাজ করার পথে বাধার সৃষ্টি হয়েছে বা হচ্ছে' এমন কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে?

এটা যদি মূলধারা ব্রিটিশ সমাজের সাথে সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্রবোধ এবং বৈপরিত্যের দৃশ্যমান চিহ্ন হয়ে থাকে; তবে খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন এসে যায় যে, ব্রিটেনের শিখ সম্প্রদায়ের মাথায় যে পাগড়ি ব্যবহার করা হয়, সেই পাগড়ি এবং মি. ষ্ট্র'র নিজের সম্প্রদায়, ইহুদি পুরুষদের মাথায় যে টুপি ব্যবহার করা হয়ে থাকে তা, এমনকি খ্রিষ্টধর্মে বিশ্বাসীরা যে গলায় ক্রস ঝুলিয়ে রাখেন, তাও তো সেই একইভাবে দৃশ্যমান বৈপরিত্য এবং সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্রবোধের পরিচায়ক! তাদের বেলায়ও তিনি সেই একই অভিযোগ উত্থাপন করবেন, যে অভিযোগটি তিনি করেছেন মুসলিম নারীদের পর্দা করার বেলায়? যদি তিনি তা না করেন, তবে যারা বলেন যে, বেছে বেছে কেবলমাত্র মুসলমান এবং ইসলামের উপরেই অতি কৌশলে আক্রমণ করা হচ্ছে, তাদের সেই কথাটাই কি সত্য হয়ে গেল না?

নেকাব বা হিজাব সে রকমই বৈপরিত্য প্রকাশ ঘটায়, ঠিক যেমন বৈপরিত্যের প্রকাশ ঘটিয়ে থাকে শিখদের মাথার পাগড়ি, ডখ্রষ্টানদের ক্রস এবং ইহুদিদের মাথার টুপি। ওই দুই সম্প্রদায়ের পোশাকের বৈপরিত্য যদি ব্রিটিশ সমাজব্যবস্থা থেকে স্বাতন্ত্রতার পরিচায়ক না হয়ে থাকে, তাদের ক্ষেত্রে ইন্টিগ্রেশনের পথে কোনো বাধা না হয়ে থাকে, তবে মুসলমানদের হিজাবের বেলায় কেন তা 'স্বাতন্ত্রতার পরিচায়ক' হিসেবে বিবেচ্য হবে? কেন তা তাদের ইন্টিগ্রেশনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে? সে বিষয়টি বোধগম্য নয় মোটেও!

মাল্টিকালচার বিশিষ্ট এই ব্রিটেন তো এই জন্যই বিশ্বের কাছে একটি আদর্শ স্থানীয় 'গণতান্ত্রিক ব্রিটেন' হিসেবে পরিচিত ও সুখ্যাতি প্রাপ্ত যে, এখানে বিভিন্ন ধর্ম ও মতাবলম্বীরা তাদের নিজ নিজ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্রবোধ, তাদের

নিজ নিজ ধর্মীয় স্বাধীনতা বজায় রেখেই একটি গণতান্ত্রিক ব্রিটেনের অধিবাসী। আজ হঠাৎ করে কেন ব্রিটেনকে সেই ঐতিহ্য, সেই সুনাম, সেই পরিচিতিকে বিসর্জন দিতে হবে? আধুনিক বিশ্বের কোন দেশে কোন জাতিসত্তাকে তাদের নিজেদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ধর্ম ও নাগরিক অধিকার বিসর্জন দিয়ে ইন্টিগ্রেটেড হতে হবে, এটাও কি আজ এই সভ্যতা গর্বিত বিশ্বের কাছে শুনতে হবে?

আসলে নেকাব বা হিজাব ইন্টিগ্রেশনের পথে কোনো বাধাই নয় তেমনই, যেমনই শিখদের পাগড়ি কিংবা খ্রিষ্টানদের ক্রস অথবা ইহুদি পুরুষদের মাথায় ব্যবহৃত বিশেষ ধরনের টুপি, কোনোটাই ব্রিটিশ সমাজে তাদের ইন্টিগ্রেশনের পথে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি।

ইন্টিগ্রেশনের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হলো বিদ্বেষপূর্ণ মানসিকতা। মূলধারার ব্রিটিশ রাজনীতিবীদ, বুদ্ধিজীবী এবং অনেক সাধারণ মানুষও পাগড়ি পরিহিত শিখকে বা টুপি পরিহিত ইহুদিকে মেনে নিতে পারলেও কেবলমাত্র মুসলমানদেরকে মেনে নিতে পারছেন না।

কিন্তু সেই তারা এই ফারিহা বা আজকের ফিওনাকে না মেনে কোথায় যাবেন? তিনি তো আর এ দেশে উড়ে আসেননি। তিনি এখানে আর দশটা ইংরেজের মতো ইংরেজ বাবা-মায়ের ঔরসে জন্ম নেওয়া, এই ইংল্যান্ডের আলো-বাতাসে, এখানকার শিক্ষা, সাংস্কৃতি আর দর্শনে বেড়ে ওঠা রক্তে মাংসে একজন ইংলিশ। তার ব্যাপারেও কি এরা বলবেন যে, ফারিহা ব্রিটিশ সমাজে পুরোপুরি ইন্টিগ্রেটেড হতে পারেননি?

ফারিহা কিন্তু এমনটা মনে তো করেনই না, বরং একবার মাত্র এক আলাপের মাঝখানে ব্রিটেনের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যাক স্ট্রর উপরিউক্ত মন্তব্যটা স্মরণ করিয়ে দিতেই তিনি রেগে লাল হয়ে গিয়েছিলেন। তার চোখ মুখের চেহারাটাই যেন বদলে গেছিল। কোনো মন্তব্য না করে কেবলমাত্র এতটুকুই বলেছিলেন, ‘একবার, মাত্র একটাবারের জন্য তাকে আমার সামনে এসে কথাটা বলতে বলুন, কেমন তার সাহস, আমিও সেটা একবার দেখতে চাই।’

তিনি রেগে গেছেন দেখে আর কথা বাড়াইনি। তবে ভালো লেগেছিল আত্মপরিচয়ের ব্যাপারে তার সচেতনতা, বলিষ্ঠতা, আর দৃঢ়তা দেখে। সত্যি বলতে কী, খুশিও হয়েছিলাম আজ কালকার এই বৈরি পরিবেশে একজন মুসলমান হিসেবে নিজের স্বকীয়তা রক্ষার ব্যাপারে কঠোরতা দেখে। অথচ তাকে দেখে কিন্তু তেমন মনে হয় না। খুবই ধীর স্থির, খুবই নরম মনে হয়। চলা-ফেরা,

কথা-বার্তায় অত্যন্ত শালীন, দৃষ্টি যেন সব সময়ই নিয়ন্ত্রিত তার। আর প্রথম দিনই তিনি নামাজের জন্য কোনো নির্ধারিত স্থান আছে কি না, সেটা জানতে চেয়ে নামাজ আদায় করেছিলেন ভিজিটিং আওয়ারে।

সেটাও বেশ চিত্তাকর্ষক ঘটনা ছিল বটে। দুপুরের দিকে দোতলায় গিয়ে নার্সিং স্টাফের অফিসে বসে তাদের এসাইন করে দেওয়া রোগীগুলোর মধ্যে থেকে কয়েকটা রোগীর কেয়ার প্লান অডিট করছি। কানাডিয়ান নার্স মেলেনি জনসনও আমার সামনেই চেয়ারে বসে আছে এবং মাঝে মাঝে আমার বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে বা প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র দেখাচ্ছে। এমন সময় এক ভারতীয় নার্সিং এ্যাসিস্ট্যান্ট সুষমা দিক্ষিত এসে মেলেনিকে জানাল যে, টমাস গ্রের ভিজিটরের জন্য একটা রুম খুলে দেওয়া যায় কি না, জানতে চাচ্ছেন, তিনি 'সালাহ' করবেন।

মেলেনি জনসন ব্যাপারটির কিছুই বুঝল না। টমাস গ্রের পালিত কন্যা, আজকের ভিজিটর হলেন ফারিহা, যিনি ভারতীয় কেয়ার এ্যাসিষ্টান্টকে দেখে তার কাছে সাহায্য চেয়েছেন, জানতে চেয়েছেন নামাজের জন্য কোনো নির্ধারিত জায়গা আছে কি না। অনুরোধ করেছেন তাকে সেরকম একটুখানি জায়গা দেওয়া যায় কি না চেষ্টা করে দেখতে, যেন তিনি 'সালাত' আদায় করতে পারেন।

'হোয়াট ইজ সালাঠ?' আমার দিকে চেয়ে তার নিজস্ব বাচনভঙ্গীতে মেলানি জনসন প্রশ্নটা করলেন। তাকে বুঝিয়ে বললাম, 'হোয়াট ইজ সালাত'। সাথে সাথে নির্দেশও দিলাম ভদ্রমহিলাকে সাহায্য করতে। সে বুঝল এবং আমার নির্দেশমত সেই নার্সিং এ্যাস্টিয়্যান্টকে একটা খালি রুমের চাবি দিয়ে পাঠিয়ে দিল তা খুলে দিতে, যেন সেখানে ফারিহা তার 'সালাত' করতে পারেন।

মেলেনি জনসনের 'হোয়াট ইজ সালাঠ' প্রশ্নটি শুনে বেশ কয়েক বৎসর আগেকার কথা মনে পড়ে গেল। মেলানি তো একজন ডখ্রিষ্টান, ইংরেজ ও কানাডিয়ান। তার জানার কথা নয় 'সালাত' জিনিসটা কী? আমরা মুসলমানরাই কি তা জানি? জানলে কি মুসলিম ঘরের সন্তান তুহিন আমাকে প্রশ্ন করতে পারত 'হোয়াট ইজ নামাজ?' বলে!

পাঁচ বৎসরের শিশু তুহিন। দূরন্তপনায় তার জুড়ি মেলা ভার। আমার এক প্রতিবেশি বাংলাদেশি পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ সন্তান। পরিবারের একমাত্র পুত্র। পরপর চারটা কন্যা সন্তানের পর জন্ম নেওয়া এই তুহিন বাবা-মায়ের নয়নের মনি

যেন। সংসারে তার দাপট একচেটিয়া। বড় চারটি বোন, মা ও বাবা, এমন কেউ নেই যার উপরে তুহিনের জোর চলে না!

আমার সাথে ছোট তুহিনের দারুণ সম্পর্ক। আমাকে সে অনেক সময় 'ফানি আংকেল' বলে ডাকে। এর কারণ, মাঝে মধ্যেই ওদের বাসায় ওর বাবার সাথে দুচারটা গল্প করতে বা কোনো কাজে গেলেই তার বায়না অনুযায়ী তাকেও দুএকটা মজার মজার গল্প শোনাতে হবে। সেই গল্পগুলো নাকি তার কাছে খুবই 'ফানি' মনে হয়। আর তাই তার বায়নাও বেড়ে চলে, আরও বেশি বেশি করে গল্প শোনাতে হবে। ওর বায়না না মিটিয়ে উঠে আসাটা রীতিমতো সাধনার ব্যাপারই বলতে হবে।

বাংলাদেশের গল্প শোনাতে চাইলে সে তা শুনতে নারাজ। কারণ, তুহিনের ভাষায় 'ব্যাংলাডেশ' হলো 'পুওর' 'মাডি এন্ড ডাষ্টি'! ওরকম একটা দেশের গল্প সে মোটেও শুনতে প্রস্তুত নয়! তুহিন ভেবেই পায়না তার নানা-নানি, দাদা-দাদি, আংকেল-আন্টি, এরা কী করে সেই দেশে থাকে? সে আরও অবাক হয় একথা শুনে যে, তার ড্যাডি-মাম্মি, তার বড় বোনগুলোও সেই 'পুওর' 'মাডি এন্ড ডাষ্টি' দেশেই জন্মেছে, সেখানেই বেড়ে উঠেছে। তুহিন অবাক হয়ে তার বাবা-মা, তার বড় বোনদের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে সে কথা শুনে।

সে নিজেও যে ওই বাংলাদেশেই জন্মেছে, সেকথা তাকে বিশ্বাস করানোই কষ্টকর! সে যে মাত্র আট মাসের শিশু অবস্থায় সেই 'মাডি এন্ড ডাষ্টি ব্যাংলাডেশ'টা ছেড়ে এসেছে, সে কথা বললে তুহিন ক্ষেপে যায়। ভাবে তাকে 'ইনসাল্ট' করার জন্যই আমরা এরকম একটা আজগুবি কথা বলছি! বারবার সে কথা স্মরণ করিয়ে দিলে নিশ্চিত হতে সে তার মায়ের কাছে ছুটে যায়, প্রকৃত ব্যাপারাটি কী তা জানার জন্য।

মা যখন তাকে এ কথাটাই জানান, তখন তুহিন চুপ করে যায়, কোনো কথা বলে না। কী জানি ওই কচি মন কী ভাবে? তবে সে বিস্ময়ে অবাকই যে হয়, সে বিষয়টা নিশ্চিত। মনে মনে হয়তো ওই শিশু 'পুওর, মাডি এন্ড ডাষ্টি ব্যাংলাডেশ' এ জন্ম নিতে হয়েছে বলে হীনমন্যতায় আক্রান্ত হয়! নিজেকে মনে মনে ধিক্কার দেয়!

নিষ্পাপ ছোট্ট শিশু তুহিনেরই বা দোষ দেবো কী? তার বাবারই এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু যিনি তুহিনদের বাড়ির অদূরেই স্বপরিবারে বসবাস করছেন, তাকে আক্ষেপ করে বলতে শুনেছি, কেন যে তার জন্মটা বাংলাদেশে হয়েছিল!

পাঁচ বৎসরের ছোট্ট শিশু, স্ট্যামিনা আর উদ্যমে ভরা। তার প্রমাণ সে আমাকে অনেকবার দেখিয়েছে। ফ্লোরে কার্পেটের উপরে শুয়ে পড়ে কী এক ধরনের দুর্বোধ্য ভঙ্গিমায় চক্রাকারে ঘোরে, একবার পেটের উপরে ভর করে মাথা, ঘাড় উঁচু করে দেয়, আবার পরক্ষণেই বিদ্যুতের গতিতে পাশ ফিরে, বৃত্তের ন্যায় আরও দুএকটা পাক খেয়ে উঠে দাঁড়ায়, তড়াক করে লাফিয়ে উঠার মতো করে! এরপর মাজা বেঁকিয়ে হাত-পা ও সেই সাথে চোখ মুখের কিম্ভূতকিমাকার সঞ্চালনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে!

প্রথমদিন তো আমি হতবাক তার এই আচরণ দেখে! ভেবেই পাচ্ছিলাম না, ছেলেটা অমন করছে কেন? অনেকক্ষণ পরে থেমে সে হাঁপাতে হাঁপাতে জানান দিল যে, এটা একটা ড্যান্স এবং তার বন্ধুরা কেউ তার সাথে এই ড্যান্সে পাল্লা দিয়ে পারে না!

আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, জীবনেও আমি এরকম ড্যান্স দেখিনি। আর ওটা যে একটা ড্যান্স, তা-ই তো জানতাম না। আজ 'মাস্টারড্যান্সার' তুহিনের কাছে সেই ড্যান্সটুকু দেখেও বুঝে উঠতে পারলাম না, কোনো শৈল্পিক সুষমার কারণে শরীরের এহেন দুর্বোধ্য এবং কিম্ভূতকিমাকার সঞ্চালনকে 'ড্যান্স' বলে আখ্যায়িত করতে হবে?

বিষয়টি তুহিনকে জানালে সে হেসেই খুন। আমি যে নের্বোধ, সে কথা বুঝতে পেরে ছোট্ট ছেলেটি আমাকে বুঝিয়ে দিল 'মাইকেল জ্যাকসন' নামে একজন খুব বড় ড্যান্সার এরকম নাচে! সে তো কেবল সেই মাইকেল জ্যাকসনের অনুকরণই করছিল!

এবারে আমার তো উজবুক এক 'ফানি আংকেল' বুঝল যে, এতক্ষণ তুহিন যা করছিল সেটা সত্যিই একটা 'ড্যান্স'! অনেক বড় মাপের নাচ! নিছক পাগলামি নয়! এবং এটাও বুঝলাম যে, আমাদের তুহিন, পাঁচ বৎসরের শিশু হলেও খুব ভালো করেই তা রপ্ত করেছে। মেধা আছে বটে ছেলেটার!

কখনো কখনো দুএক সপ্তাহই চলে যায় নিজের ব্যস্ততার কারণে তাদের বাসায় যাওয়া হয়ে ওঠে না। তুহিনের সাথেও দেখা হয় না। তার বাবা কিংবা মা মাঝে মধ্যেই বলেন যে, তুহিন নাকি তার 'ফানি আংকেল' এর খোঁজ করে প্রায়ই। বাবা কিংবা মায়ের কাছে জানতে চায় 'ফানি আংকেল' কেন আসে না তাদের বাড়িতে?

গত বড়দিনের দিন দুয়েক আগে ঘটনাক্রমে তার বাবার সাথে দেখা হয়ে গেলে তিনি চায়ের আমন্ত্রণ জানালেন। হাতে অবসর থাকায় আমিও কোনো কথা না বাড়িয়ে গিয়ে উঠলাম তাদের বাড়িতে। ড্রয়িংরুমে বসে বসে তুহিনের বাবার সাথে আলাপ করছিলাম আর সেই সাথে চায়ের কাপটাও শেষ করা হচ্ছিল।

এরই মাঝে দোতলা থেকে তুহিন নেমে এল হৈ হৈ করতে করতে। সে তার ‘ফানি আংকেল’কে পেয়েছে অনেকদিন পরে, আজ দুটি গল্প না বলে আংকেলের আর মুক্তি নেই! ভাবখানা এমনই আর কী! এমনটাই ভেবেছিলাম। কিন্তু না, আজ সে আর গল্পের বায়না ধরল না, বরং বড় আগ্রহ ভরে সে তার ‘ফানি আংকেল’কে হাতে ধরা অনেকগুলো গ্রিটিংস কার্ড দেখালো, এক এক করে সে সেই কার্ডগুলো কোনটা কার জন্য, সে কথাও ব্যাখা করে চলল। সে তার বন্ধু-বান্ধবদের গ্রিট করবে বড়দিন উপলক্ষে। কার্ডগুলো বড় আগ্রহভরে আমাকে এক এক করে দেখাল। তার বাবা-মাকে কার্ড দেবে, তার বোনদেরও দেবে। সে জন্যই কার্ডগুলো আনিয়েছে, সে কথাও জানান দিল। আমাকেও একটা কার্ড দেবে বলে সে নিশ্চিত আশ্বাস দিল, পাছে যেন আমি আবার নিরাশ না হই, সে জন্য!

নিজের প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যেও চেষ্টা করি শুক্রবার দিনটি সাপ্তাহিক ছুটির দিন হিসেবে নেওয়ার। কখনো কখনো সফল হই, কখনো বা শত চেষ্টা করেও শুক্রবার দিনটিতে ছুটি ম্যানেজ করে উঠতে পারি না। আর যদি কখনো সাপ্তাহিক ছুটি শুক্রবার নিতে পারি, তবে সেদিনটি আমার প্রতিবেশী বন্ধু প্রবরকে সাথে করেই জুম্মার নামাজটি পড়তে যাই মসজিদে।

যাওয়ার সময় প্রায় প্রতিবারই প্রতিবেশী ভদ্রলোক তুহিনের বাবাকে তার বাড়ি থেকে ডেকে নিতে হয়। তিনিও সানন্দে আমার সাথী হন মসজিদ পর্যন্ত। দুজনে হাঁটতে হাঁটতে মসজিদ পর্যন্ত যাই, নামাজ শেষে আবার দুজনে একই সাথে গল্প করতে করতে বাসায় ফিরি। ভদ্রলোককে বারবার বলেছি তার ছোট্ট ছেলেটা তুহিনকেও যেন তিনি সাথে নেন মসজিদ পর্যন্ত, কিন্তু তিনি প্রতিবারই সে কথা নাকচ করে দিয়েছেন এই বলে যে, ‘একেবারে ছোট, আরও একটু বড় হোক তখন নাহয় সাথে করে নেওয়া যাবে।’

বোঝানোর চেষ্টা করেছি, এখন এই বয়সে ছেলেটাকে যদি নামাজ, মসজিদ, এসব মৌলিক ইসলামি বিষয়াদির সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া না যায়; তবে আর একটু বড় হলে সে পথে তাদের নেওয়া যাবে তেমনটা আশা করা মোটেও সঙ্গত হবে না। কিন্তু তিনি সে কথা খুব একটা কানে নিচ্ছেন বলে মনে

হয়নি। তার অনাগ্রহ দেখে শেষ পর্যন্ত নিরাশ হয়েই হাল ছাড়তে হয়েছে, পাছে না আবার তিনি বিরক্তবোধ করেন ভেবে!

একদিন সুযোগ বুঝে তার স্ত্রী, তুহিনের মাকে বললাম কথাটা। যতটা নরমভাবে বলা সম্ভব, বুঝিয়ে বললাম, ‘আপনারা যে মাইকেল জ্যাকসনের অনুকরণে তুহিনের সেই কিম্ভূতকিমাকার নাচ দেখে যারপরনাই প্রীত হন, ছেলে মানুষের নিরেট ছেলেমানুষি ভেবে উপেক্ষা করেন, আসলেই সেটা কি ছেলেমানুষি?